চতুর্বিংশ অধ্যায়

গুপ্তরাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা

রাজা : কর্তৃত্ব ও সীমাবদ্ধতা : গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন রাজা। তিনি নিছক রাজা উপাধিতে তুষ্ট নন, আড়ম্বরপূর্ণ অভিধার প্রতি তাঁর আকর্ষণ। তাই তাঁর উপাধি মহারাজাধিরাজ, পরমদৈবত ও পরমভট্টারক। পরমদৈবত পদের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রধান দেবতা। পরমভট্টারক পদের অর্থও তাই। এ দু'টি অভিধা গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজার দেবত্বের দাবি উচ্চারিত হয়েছে। রাজা সাধারণ মানুষ নন, তিনি দেবতা, মহান দেবতা। এই প্রসঙ্গে এলাহাবাদ স্তম্ভলেখের সাক্ষ্য অনুধাবনযোগ্য। লেখটিতে সমুদ্রগুপ্তকে অচিন্ত্যপুরুষ, লোকধামদেব এবং ধনদ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ ও অন্তকের (যম) সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ত মুদ্রায় নিজেকে কৃতান্ত অর্থাৎ যমের পরশু বা কুঠারবরূপে পরিচয় দিয়েছেন। রাজার দেবত্বের দাবি কোনও এক আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পিছনে বিশেষ এক উদ্দেশ্য কাজ করছিল। প্রজাবর্গের আনুগত্য ছাড়া রাজা রাজ্য চালাতে পারেন না। সম্ভ্রমবোধ থেকেই আনুগত্য জন্মায়। রাজা দেবতা এই বোধ জাগলেই রাজার প্রতি প্রজাদের সম্ভ্রমবোধ জন্মাবে, প্রজারা রাজার প্রতি অনুগত থাকবেন, রাজপদ নিষ্কণ্টক হবে। নিজেকে সুকৌশলে দেবতার আসনে বসিয়ে রাজা প্রজাদের উপর আপন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

রাজার মৃত্যু হলে সাধারণত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজপদ লাভ করতেন। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যেত। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কেউই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র নন তবু তাঁরা সকলেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই রাজপদ তাঁরা স্বাধিকারে অর্জন করেননি, পেয়েছিলেন বাহুবলে বা পিতার অনুগ্রহে।

কখনও কখনও রাজা তাঁর জীবিতকালে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে রাজপদের জন্য মনোনীত করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত জ্যেষ্ঠত্বের দাবি উপেক্ষিত হয়, যোগ্যতার প্রশ্নই প্রাধান্য পায়।

বিবিধ ক্ষমতার অধিকারী রাজা। তিনি প্রদেশপালদের নিযুক্ত করেন। প্রথম কুমারগুপ্ত চিরাতদত্তকে পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর বাংলার প্রদেশপালের পদে নিয়োগ করেন। পরবর্তিকালে সম্রাট বুধগুপ্ত ব্রহ্মদত্ত নামে আর এক ব্যক্তিকে উত্তর বাংলার প্রদেশপাল নিযুক্ত করেন। কখনও কখনও রাজা জেলাশাসক নিয়োগের দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। এমনটি ঘটেছিল পঞ্চনগরী জেলার অধিকর্তা কুলবৃদ্ধির নিয়োগের ক্ষেত্রে। উত্তর বাংলার তৎকালীন প্রদেশপাল নন, স্বয়ং গুপ্তসম্রাট তাঁকে স্বপদে নিযুক্ত করেন। তাছাড়া মহাদণ্ডনায়ক, মহাবলাধিকৃত, সান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার প্রভৃতি পদস্থ কেন্দ্রীয় রাজপুরুষদের রাজাই স্বপদে নিযুক্ত করতেন; তাঁদের পদের স্থায়িত্বও একান্তভাবে রাজার মর্জির উপরই নির্ভর করত।

শুধু স্বরাষ্ট্র নয়, পররাষ্ট্র, সামরিক ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়েও রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব। তিনি পররাষ্ট্রনীতির রূপকার, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও রাজ্যের প্রধান বিচারপতি। এসব কাজে রাজা পদস্থ রাজপুরুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন ঠিকই কিন্তু সর্ব বিষয়ে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত ছিল।

নীতিগতভাবে রাজা সর্বশক্তিমান হতে পারেন কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার উপরই তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা নির্ভর করে। সমুদ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন তা নিশ্চয় নরসিংহগুপ্ত বা বিষ্ণুগুপ্তের মতো তাঁদের দুর্বল উত্তরসূরিদের ছিল না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তাছাড়া গুপ্তরাজতন্ত্রের ভিত বরাবরই দুর্বল ছিল। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় এককেন্দ্রিকতার সাফল্যের উপর রাজশক্তি তথা সরকারের প্রকৃত কর্তৃত্ব নির্ভর করে। অথচ কারণ যাই হোক না কেন, গুপ্ত রাজারা এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। সমুদ্রগুপ্তের মতো পরাক্রমশালী রাজা রাজ্যের বিরাট একটি অংশের শাসনভার কার্যত স্বাধীন প্রশাসকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এসব প্রশাসক নামমাত্র আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও নির্ধারিত কর দানের বিনিময়ে কার্যত স্বাধীন নরপতির ন্যায় শাসন-কার্য পরিচালনা করতেন। এ সব অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসন জোরদার হলে রাজশক্তিই সুদৃঢ় হত, সুসংহত হত। পরবর্তিকালে গুপ্ত প্রশাসন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়, রাজশক্তি দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে।

রাজ্যের যেসব অঞ্চল রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল অন্তত সেসব স্থানে যে রাজার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বোধহয় বলা যায় না। অশোকের আমলে মৌর্যসম্রাট তথা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে আঞ্চলিক প্রশাসকদের নিবিড়, ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আঞ্চলিক প্রশাসকদের কার্যকলাপের প্রতি সম্রাটের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আঞ্চলিক প্রশাসকেরা যাতে স্বেচ্ছাচারী না হন, রাজ্যের সর্বত্র যাতে একই নিয়ম বা বিধান প্রচলিত থাকে, সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। প্রদেশপালদের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে প্রায়ই নির্দেশ জারি হত। কেন্দ্রীয় সরকারই জেলা-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজপুরুষদের নিয়োগ করতেন। প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সম্রাট নিয়মিত রাজ্য পরিক্রমায় বের হতেন।

কিন্তু গুপ্তপর্বে প্রদেশের উপর কেন্দ্রের সে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। রাজা প্রদেশপাল নিয়োগ করতেন ঠিকই কিন্তু তাঁর কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন বলে মনে হয় না। রাজা কোনও প্রদেশপালকে প্রশাসনিক নির্দেশ দিচ্ছেন বা রাজপুরুষদের কার্যকলাপ ও জনসাধারণের অবস্থা অবগতির জন্য প্রদেশ পরিক্রমায় বের হচ্ছেন, এধরনের তথ্য সমকালীন লেখমালা বা সাহিত্যে নেই। মৌর্যযুগে জেলাস্তরের রাজপুরুষরাও সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন কিন্তু এই পর্বে প্রদেশপালরাই সাধারণত সে অধিকার ভোগ করতেন। পঞ্চনগরী বিষয়ের অধিকর্তা কুলবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু এই পর্বে এ ধরনের ঘটনার বেশি নজির নেই।

গুপ্ত প্রশাসনে, বিশেষ করে গ্রাম ও জেলার স্তরে, জনপ্রতিনিধিত্বের বড় রকমের ভূমিকা ছিল। জেলার আধিষ্ঠানাধিকরণের অন্তত চারটি আসন জনপ্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এঁদের মধ্যে তিনজনই ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, চতুর্থজন লিপিকর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শুধু জেলার স্তরে নয়, নগর ও গ্রামের স্তরেও উপদেষ্টা পরিষদ বা কার্যকরী সমিতি ছিল যা মূলত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই পরিষদের অনুমোদন ছাড়া ভূমির ক্রয়, বিক্রয় ও দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হত না। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সংযোগ রাজশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল, সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক রামশরণ শর্মা গুপ্ত সম্রাটদের ভূ-দান প্রথার মধ্যে রাজশক্তির অবক্ষয়ের বীজ লক্ষ করেছেন। লেখমালার সাক্ষ্য হতে জানা যায় গুপ্ত রাজারা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভূ-সম্পদ দান করতেন। অধ্যাপক শর্মা মনে করেন, অগ্রহার ব্যবস্থায় গ্রহীতা যে কেবল ভূমি হতে সংগৃহীত রাজস্ব ভোগ করতেন তা নয়, ভূখণ্ডের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। অধ্যাপক শর্মা মনে করেন, এর ফলে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রাজা তথা রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার বিনষ্ট হয় ও ভূস্বামীদের আর্থ-প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে রাজার অধিকার সংকুচিত হয়েছিল, এ মত অনেকেই সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন প্রদত্ত জমির বেশির ভাগই ছিল অনাবাদি। তাছাড়া সারা রাজ্যের তুলনায় প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ এতই নগণ্য ছিল যে রাজার প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের উপর অগ্রহার ব্যবস্থার প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছিল বললেই চলে। ভূমি-সম্পদ দানের সঙ্গে রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর হত এই বক্তব্যের সঙ্গেও তাঁরা একমত নন।

কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র : সুদক্ষ রাজপুরুষদের সাহায্য ছাড়া রাজা একা যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম নিষ্পন্ন করতে পারেন না। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের লেখমালায় সান্ধিবিগ্রহিক, মহাদণ্ডনায়ক, মহাপীলুপতি, মহাবলাধিকৃত, অক্ষপটলাধিকৃত, কুমারামাত্য প্রভৃতি অনেক পদস্থ রাজপুরুষের উল্লেখ আছে যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তির লেখক হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। বীরসেন শাব ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সান্ধিবিগ্রহিক। সন্ধি বলতে এক ধরনের চুক্তি বোঝায় যার ফলে বিবদমান দুই বা ততোধিক গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। বিগ্রহের অর্থ যুদ্ধ। অর্থাৎ যে মন্ত্রী যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের কাজে নিযুক্ত, তিনিই সান্ধিবিগ্রহিক। পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত। রাজনীতি ও সমরবিদ্যায় তিনি নিপুণ ছিলেন। কখনও কখনও তাঁকে রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন পশ্চিমা ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন বীরসেন শাব তাঁর অনুগমন করেন। হরিষেণও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

মহাদণ্ডনায়কের ঠিক কী কাজ ছিল, সে সম্পর্কে কোনও সুনিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব নয়। আসলে দণ্ড পদটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেই এই বিপত্তি। এক অর্থে দণ্ড জরিমানা বোঝায়। এই অর্থে জরিমানা যিনি ধার্য করেন তিনিই দণ্ডনায়ক অর্থাৎ বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি যিনি তিনি মহাদণ্ডনায়ক। দণ্ড বলতে শাস্তিদণ্ডও বোঝায়। যিনি শাস্তিদণ্ড ধারণ করেন সেই পদস্থ পুলিশ কর্মচারীও দণ্ডনায়ক। পুলিশ বিভাগের প্রধান যিনি তিনি মহাদণ্ডনায়ক। আবার দণ্ডের অর্থ সেনাবাহিনী। সেক্ষেত্রে সেনাপতি এই অর্থে দণ্ডনায়ক। মুখ্য সেনাপতি যিনি তিনিই মহাদণ্ডনায়ক। বেশির ভাগ পণ্ডিত মনে করেন, গুপ্তযুগে মহাদণ্ডনায়ক সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তির লেখক হরিষেণ ও তাঁর পিতা ধ্রুবভূতি উভয়েই মহাদণ্ডনায়ক ছিলেন।

সামরিক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর এক পদস্থ রাজপুরুষ হলেন মহাবলাধিকৃত। প্রধান সেনাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। হস্তিবাহিনীর পরিচালনভার ছিল মহাপীলুপতির উপর।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আর এক শ্রেণির পদস্থ কর্মচারী হলেন কুমারামাত্য। হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের কুমারামাত্য ছিলেন। শিখরস্বামী ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের এবং পৃথিবীষেণ প্রথম কুমারগুপ্তের। অনেকে কুমারামাত্যকে রাজার একান্তসচিব, আবার কেউ বা তাঁকে রাজস্ব-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে চিহ্নিত করেছেন।

এসব রাজপুরুষরা রাজানুগ্রহেই স্বপদে বহাল হতেন। একই পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। হরিষেণের মতো তাঁর পিতাও একজন মহাদণ্ডনায়ক ছিলেন। শিখরস্বামী ও তাঁর পুত্র পৃথিবীষেণ যথাক্রমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তের মন্ত্রি-কুমারামাত্য ছিলেন। বীরসেন শাব ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

একজন পদস্থ রাজপুরুষ। উত্তরাধিকারসূত্রে এ পদ লাভ করেছেন বলে তিনি উদয়গিরি গুহালেখে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। জন্ম পদ-নিয়োগের মাপকাঠি হলে যোগ্যের অনাদর নয়, প্রশাসনে জড়তা ও শৈথিল্য দেখা দেয়। গুপ্ত আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশির ভাগ পদ বংশানুক্রমিক হওয়ায় প্রশাসনে নিঃসন্দেহে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

সেসময় কখনও কখনও একই পদে একাধিক ব্যক্তি নিযুক্ত হতেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ যখন উৎকীর্ণ হয় তখন প্রশস্তিকার হরিষেণ এবং লেখটির যিনি তত্ত্বাবধান করেছেন সেই তিলভট্টক উভয়েই মহাদণ্ডনায়কের পদে আসীন ছিলেন। আবার অনেক সময় একই ব্যক্তিকে একাধিক পদের দায়িত্ব দেওয়া হত। হরিষেণ শুধু প্রতিরক্ষা ও বিদেশ দপ্তরেরই ভারপ্রাপ্ত ছিলেন না, তিনি সেনাবাহিনীরও অধ্যক্ষ ছিলেন। কখনও কখনও মন্ত্রীদের এক দফতর থেকে অন্য দফতরে বদলি করা হত। এমনটি ঘটেছিল মন্ত্রী পৃথিবীষেণের ক্ষেত্রে। তিনি প্রথমে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের কুমারামাত্য ছিলেন কিন্তু পরে মহাবলাধিকৃতের পদ অলংকৃত করেন।

মৌর্যযুগে যেমন মন্ত্রীরা ছিলেন, তেমনি মন্ত্রিপরিষৎ নামে এক প্রশাসনিক সংস্থাও ছিল। গুপ্তযুগে কেন্দ্রে এধরনের কোনও পরিষৎ ছিল কিনা বলা কঠিন। বিলসড় শিলা স্তম্ভলেখে 'পর্ষদ'-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেটি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষৎ ছিল তার কোনও সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে সভ্যগণের উল্লেখ আছে। তাঁরা কী কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন? এখানেও সংশয় আছে।

যুবরাজ : কেন্দ্রীয় প্রশাসনে যুবরাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজার অনুপস্থিতিতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষপর্বে রাজকুমার স্কন্দগুপ্তকে সম্ভবত এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কখনও কখনও প্রদেশের শাসনভার যুবরাজের স্কন্ধে ন্যস্ত হত। বৈশালীতে পাওয়া একটি সিলমোহর হতে এ তথ্য জানা যায়। প্রশাসনিক কাজে কুমারামাত্য নামে এক পদস্থ রাজপুরুষ যুবরাজকে সাহায্য করতেন। কুমারামাত্যের অধীনে একটি দফতর বা অধিষ্ঠান ছিল।

রানি : প্রশাসনে রানির বিশেষ কোনও ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না। কুমারদেবী তাঁর স্বামী প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একযোগে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেও বেশির ভাগ পণ্ডিতই এ মতের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও রানিদের মূর্তি সরকারি মুদ্রায় খোদিত হয়েছে বটে কিন্তু তাতে তাঁদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব আভাসিত হয় না।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা : প্রশাসনের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিকে সাধারণত ভুক্তি এবং অন্যত্র প্রদেশগুলিকে দেশ বলা হত। গুপ্ত লেখমালায় সুকুলি ও সুরাষ্ট্র নামে দু'টি দেশের উল্লেখ আছে। এসময় সম্ভবত ডাভাল ও কালিন্দী-নর্মদা দোয়াব নামে আরও দু'টি দেশ ছিল। সুকুলিদেশের সঠিক অবস্থান জানা যায় না কিন্তু সুরাষ্ট্র এবং ডাভাল বলতে যে গুজরাত ও জব্বলপুর অঞ্চল বোঝাত তা নিশ্চিত। গুপ্ত ও উত্তর পর্বের লেখমালায় পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ), বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ), তীর (উত্তর বিহার), নগর (দক্ষিণ বিহার), শ্রাবস্তী (অযোধ্যা-ফৈজাবাদ) ও অহিচ্ছত্র (রোহিলখণ্ড) ভুক্তির উল্লেখ আছে।

জুনাগড় শিলালেখ হতে জানা যায়, স্কন্দগুপ্ত বিভিন্ন দেশগুলিতে গোপ্তাদের নিয়োগ করেছিলেন (সর্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৃন্)। এর থেকে অনুমান করা যায় দেশের শাসনকর্তাদের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

গোপ্তা বলা হত। ভুক্তির শাসকের পদবি ছিল উপরিক। পরের দিকে ভুক্তির শাসকরা উপরিক পদবিতে সন্তুষ্ট না থেকে উপরিক মহারাজ অভিধা ধারণ করেন।

কখনও কখনও দেশ বা ভুক্তির শাসনকর্তার পদে রাজপুত্রদের নিয়োগ করা হত। পঞ্চম দামোদরপুর লেখে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসকরূপে রাজপুত্র দেবভট্টারকের উল্লেখ আছে। তিনি সম্ভবত একজন গুপ্তরাজকুমার ছিলেন। তীরভুক্তির উপরিক গোবিন্দগুপ্তও গুপ্তরাজবংশের সন্তান ছিলেন। এযুগের আর এক প্রদেশপাল ঘটোৎকচগুপ্তও সম্ভবত রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। রাজপুত্র নন, এমন ব্যক্তিও কখনও কখনও প্রদেশপালের কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। সুরাষ্ট্রদেশের প্রশাসক পর্ণদত্ত বা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা চিরাতদত্ত কেউই গুপ্ত রাজ-পরিবারের সদস্য ছিলেন না।

বৈশালীতে পাওয়া সিলমোহরগুলিতে সেযুগের প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই সিলমোহরগুলি হতে জানা যায়, রাজপুত্র গোবিন্দগুপ্ত উত্তর বিহারের তীরভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন। কুমারামাত্য, মহাপ্রতিহার, তলবর, মহাদণ্ড-নায়ক, বিনয়স্থিতিস্থাপক, ভটাশ্বপতি প্রভৃতি শ্রেণির সামরিক ও বেসামরিক রাজপুরুষরা তাঁকে প্রশাসনিক ও সামরিক কাজকর্মে সাহায্য করতেন। কুমারামাত্যকে তো যুবরাজপাদীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কুমারামাত্যের পরিচালনাধীন একটি দফতর ছিল যাকে অধিকরণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাপ্রতিহার সম্ভবত প্রাসাদ-রক্ষিবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তলবর বলতে সম্ভবত কোনও সেনাধ্যক্ষ বা অঞ্চল-প্রধানকে বোঝাত। বিনয়স্থিতিস্থাপক হয়তো ধর্ম ও নীতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্দির ও বিহারাদির তত্ত্বাবধান এবং জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও শিক্ষার সম্প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। কেউ কেউ বিনয় ও স্থিতি বলতে আইন ও শৃঙ্খলা বোঝেন। তাঁরা মনে করেন, বিনয়স্থিতিস্থাপক পুলিশ বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ভটাশ্বপতি সম্ভবত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

বৈশালীতে প্রাপ্ত সিলমোহরে রণভাণ্ডাগারাধিকরণ, বলাধিকরণ, দণ্ডপাশাধিকরণ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক দফতরের উল্লেখ আছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, রণভাণ্ডাগারিক, বলাধিকৃত ও দণ্ডপাশিক নামের তিনজন পদস্থ রাজপুরুষও প্রাদেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রণভাণ্ডাগারিক ছিলেন সামরিক সরঞ্জাম ও রসদের দায়িত্বে। বলাধিকৃত ছিলেন পদাতিক বাহিনীর প্রধান। দণ্ডপাশিক সম্ভবত পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

জেলা-প্রশাসন : এক একটি ভুক্তি বা দেশ কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত আমলের বিষয় আধুনিককালের প্রশাসনিক বিভাগ জেলার মতো। গুপ্তলেখমালায় লাট, ত্রিপুরী, ঐরিকিণ, অন্তর্বেদি, গয়া, কোটিবর্ষ, খাদাটাপার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। গুপ্তশাসনের প্রথম দিকে বিষয়ের মুখ্য প্রশাসককে সাধারণত কুমারামাত্য বা আয়ুক্তক বলা হত। কিন্তু পরের দিকে এ দু'টি পদবির বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। তার পরিবর্তে বিষয়পতি পদবিই জনপ্রিয় হয়। কুমারামাত্য বা বিষয়পতিকে সাধারণত প্রাদেশিক শাসনকর্তাই নিযুক্ত করতেন। উত্তর বাংলার কোটিবর্ষ বিষয়ের প্রশাসক বেত্রবর্মার নিয়োগের ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। কখনও কখনও স্বয়ং সম্রাট সরাসরি বিষয়পতিকে নিয়োগ করতেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সর্বনাগকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অন্তর্বেদির প্রশাসকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যে জেলাশাসককে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন তিনি নিঃসন্দেহে প্রাদেশিক শাসনকর্তারই অধীনে কাজ করতেন। যাঁকে সম্রাট সরাসরি নিয়োগ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

করতেন তিনি সম্ভবত সম্রাট তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ছিলেন।

বিষয়পতির কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। যাওবা পাওয়া যায়, তা সবই জমির ক্রয়, বিক্রয় ও দানে তাঁর ভূমিকাসম্পর্কিত। অনুমান করা যায়, তাঁরই নির্দেশে বিষয়ের সাধারণ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হত। তাঁকে সম্ভবত কোনও সামরিক দায়িত্ব বহন করতে হত না।

বিষয়পতিকে কাজে সাহায্য করার জন্য যেমন পুস্তপাল প্রভৃতি অনেক সরকারি কর্মচারী ছিলেন, তেমনি তাঁকে পরামর্শ বা সাহায্য দানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষৎ বা কার্যকরী সমিতিও ছিল। সমকালীন লেখমালায় এই পরিষদকে অধিকরণ বা অধিষ্ঠানাধিকরণ বলা হয়েছে। নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথমকুলিক ও প্রথমকায়স্থ এই পরিষদের মুখ্য সদস্য ছিলেন। তাছাড়া বিষয়-মহত্তর নামে পরিচিত বিষয়ের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও সম্ভবত এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নগরশ্রেষ্ঠী ছিলেন সম্ভবত জেলা শহরের মুখ্য ব্যবসায়ী। শকটে পণ্যসম্ভার সাজিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে যাঁরা ব্যবসা করতেন তাঁদের সার্থ বলা হত। তাঁদের যিনি প্রধান তিনি সার্থবাহ। জেলার কারিগর-শিল্পীদের যিনি অগ্রগণ্য তিনিই প্রথমকুলিক। লিপিকরদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রথমকায়স্থ। বিভিন্ন পেশার এই সব শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ও কায়স্থদের নিজস্ব সংগঠন বা গিল্ড ছিল। হয়তো তাঁরা নিজ নিজ সংগঠন থেকে নির্বাচিত হয়ে জেলা-পরিষদের সদস্যপদ লাভ করতেন। নির্বাচিত হয়ে নয়, বিষয়পতি কর্তৃক মনোনীত হয়ে তাঁরা জেলা-অধিকরণে যোগদান করতেন এমন সম্ভাবনাও বাতিল করা যায় না। সরকারি নথি-পত্র-দস্তাবেজের যিনি সংরক্ষক তিনি পুস্তপাল। উত্তর বাংলার দামোদরপুর গ্রামে পাওয়া তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায় প্রতিটি জেলায় একাধিক পুস্তপাল ছিলেন।

বিষয়পতি, পুস্তপাল প্রভৃতি জেলাস্তরের বিভিন্ন রাজপুরুষরা কী বেতন পেতেন এবং সে বেতন তাঁদের নগদে, না নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভূমিরাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেওয়া হত সে সম্পর্কে কোনও সুনিশ্চিত তথ্য নেই।

গুপ্তযুগের জেলাস্তরের শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মতো। প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা এই পর্বের শাসন-ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জেলা-পরিষদের নগরশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি সদস্যদের কেউই সরকারি কর্মচারী ছিলেন না, তাঁরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় ছিলেন। জেলা-প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব এর আগে তেমন অনুভূত হয়নি। দ্বিতীয়ত, মৌর্য আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের জেলাপ্রশাসনের উপর যে প্রত্যক্ষ, কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা এই পর্বে দেখা যায় না। গুপ্তসম্রাটেরা কখনও কখনও জেলা-প্রশাসকদের সরাসরি নিযুক্ত করতেন ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই এই দায়িত্ব বহন করতেন। ফলে বিষয়পতিদের সিংহভাগই প্রদেশপালদের নির্দেশেই তাঁদের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ ছিল না। যেসব অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়পতিদের সরাসরি নিয়োগ করতেন সেসব অঞ্চলেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কতখানি সক্রিয় ছিল বলা শক্ত। মৌর্য আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক পাঠানোর যে বিধি ছিল বা স্বয়ং সাম্রাজ্য পরিক্রমার যে নীতি মহামতি অশোক প্রবর্তন করেছিলেন গুপ্তযুগে তার কোনও নিদর্শন নেই।

গ্রাম-প্রশাসন : এক একটি বিষয় কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনভার যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল তিনি গ্রামিক। গুপ্তলেখমালায় গ্রামিকের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্রামিক গ্রামের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, না সরকারি রাজপুরুষরূপে তাঁর কাজকর্ম পরিচালনা করতেন, তা স্পষ্ট নয়। স্মৃতিকার মনু গ্রামিককে সরকারি কর্মচারী রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

গ্রামিক নিজের খেয়াল-খুশিমতো গ্রামের কাজকর্ম পরিচালনা করতেন না, গ্রামসভার পরামর্শক্রমেই তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামসভা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বাংলায় একে বলা হত অষ্টকুলাধিকরণ; বিহারে গ্রামজনপদ; মধ্যভারতে পঞ্চমণ্ডলী। গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এই সভা গঠিত হত। গ্রামবাসীরাই সম্ভবত সভ্যদের মনোনীত করতেন। যেসব চাষীদের নিজস্ব খেতখামার ছিল সেই কুটুম্বীরাও গ্রামসভার সদস্য হতে পারতেন। গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, বাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি, জনহিতকর কাজকর্মের অনুষ্ঠান, রাজস্বসংগ্রহ, জমির সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব গ্রামসভার উপর ন্যস্ত ছিল।

সাধারণ মন্তব্য : দেখা যাচ্ছে, গুপ্তসম্রাটেরা প্রজাদের মনে সম্ভ্রম উদ্রেকের জন্য গালভরা উপাধি ধারণ করেছেন, নিজেদের উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন, তবু প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে তেমন দৃষ্টি দেননি। ফলে মৌর্য আমলে প্রশাসন-ব্যবস্থায় যে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল, গুপ্তপর্বে তা দেখা যায়নি। কাগজে-কলমে রাজা সর্বশক্তিমান হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে মৌর্য রাজাদের তুলনায় গুপ্ত রাজারা নিষ্প্রভই ছিলেন বলা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। এসময় জেলা ও গ্রামস্তরের প্রশাসনে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ফলে শাসন-পরিচালনায় যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টি হল তেমনটি পূর্বে আর কখনও হয়নি। রাজা-শাসিত রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধি তথা জনগণের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর আকস্মিকতার সঙ্গে ঘটে না ; দীর্ঘ সংগ্রামের পর, অনেক মূল্যের বিনিময়েই জনগণের এ অধিকার আয়ত্ত হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল দিকটি আজও অনালোকিতই থেকে গেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় : ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (কোলকাতা, ১৯৮৪)।
Agarwal, Ashvini : *Rise And Fall Of The Imperial Guptas* (Delhi, 1989).
Altekar, A. S. : *State And Government In Ancient India* (Banaras, 1955).
Ganguly, D. K. : *Aspects Of Ancient Indian Administration* (New Delhi, 1979).
Ghosal, U. N. : *A History Of Indian Political Ideas* (Bombay, 1959).
Majumdar, R. C. : *The Classical Age* (Bombay, 1962); *The Vākāṭaka-Gupta Age* (Lahore, 1946); *A Comprehensive History Of India*, III, Part I (New Delhi, 1981).
Raychaudhuri, H. C. : *Political History Of Ancient India* (Calcutta, 1953).
Saletore, B. A. : *Ancient Indian Political Thought And Institutions* (Calcutta, 1963).
Sharma, R. S. : *Aspects Of Political Ideas And Institutions In Ancient India* (Banaras, 1959) ; *Indian Feudalism* (Delhi, 1980).

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner